রাজশাহীতে ওলন্দাজদের প্রাচীন স্থাপত্য

'বড়কুঠি'তে পুলিশ ফাঁড়ি!

● সাইফ শিপন

ব্যবসা-বাণিজ্য করতে এসে ওলন্দাজরা রাজশাহী মহানগরের পদ্মাপারে নির্মাণ করেছিল বড়কুঠি। কিন্তু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসনক্ষমতা দখল করার পর ১৮৩৩ সালে ওলন্দাজরা এ উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। রাজশাহীতে ওলন্দাজদের পরিত্যক্ত কুঠিটি তখন কিনে নেয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এখন এটির তত্ত্বাবধান করছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

তিন বছর আগে এ বড়কুঠিকে 'হেরিটেজ' ঘোষণার উদ্যোগ নেয় রাজশাহী সিটি করপোরেশন। তখন দুই ডাচ আর্কিভিস্ট বড়কুঠি পরিদর্শন করে সব ধরনের সহযোগিতা করারও আশ্বাস দেন। অথচ এখন ওই বড়কুঠিতেই স্থানান্তর করা হচ্ছে মালোপাড়া পুলিশ ফাঁড়ি! মহানগরীর বোয়ালিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবদুস সোবহান বলেন, 'মালোপাড়া পুলিশ ফাঁড়িটি বড়কুঠিতে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়েছে। তবে ওই ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্লাব থাকার কারণে এর মাঝখান দিয়ে আগে দেয়াল তোলা হবে, এরপরই হবে পুলিশ ফাঁড়ি।'

পরিবেশবাদী সংগঠন 'হেরিটেজ রাজশাহী'র প্রতিষ্ঠাতা অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ পরিদর্শক এসএম মাহাবুব সিদ্দিকী বলেন, 'প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শন এই স্থাপনা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ ছাড়া কারো কাছে হস্তান্তর করা উচিত নয়।' রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এটি সিটি করপোরেশনকে হস্তান্তর করতে চেয়েছিল। ডাচ আর্কিভিস্টরা ওই সময় নেদারল্যান্ডসের রোটারি ক্লাবের সঙ্গে আলোচনা করে জানিয়েছিলেন, বাংলাদেশে ডাচদের নির্মিত যতগুলো ভবন রয়েছে তার মধ্যে বড়কুঠিই সবচেয়ে প্রাচীন। রাজশাহী সিটি করপোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী আশরাফুল হক বলেন, 'বড়কুঠি গবেষণার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা। হেরিটেজ ঘোষণা করে বড়কুঠিকে নগর জাদুঘরে রূপান্তরের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল। কিন্তু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভবনটি শেষ পর্যন্ত হস্তান্তরে রাজি না হওয়ায় ব্যাপারটি আর এগোয়নি।'

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিজানউদ্দিন এ ব্যাপারে বলেন, 'মালোপাড়া ফাঁড়িতে সংস্কারের কাজ চলছে বলে অস্থায়ীভাবে পুলিশকে এটা ব্যবহার করতে দেয়া হয়েছে। সংস্কারকাজ শেষ হলেই পুলিশ চলে যাবে।' রাজশাহীর বড়কুঠি নির্মাণের নির্দিষ্ট তারিখ জানা না গেলেও ঐতিহাসিক সূত্র মতে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে ওলন্দাজরা রাজশাহী শহরে রেশম ও নীলের ব্যবসা শুরু করেন। ওই শতাব্দীর মাঝামাঝি কোনো এক সময় তারা বড়কুঠি নির্মাণ করে বলে জানা যায়। দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলে বড়কুঠি সরকারি সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং খাদ্য বিভাগের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯৫৪ সালে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হলে বড়কুঠি বিশ্ববিদ্যালয়কে হস্তান্তর করা হয়।

শিক্ষা ছাড়াই বেড়ে উঠছে আশ্রয়ণশিশু

● শংকর লাল দাশ

জুলেখা, মায়া, আয়েশা, বাবুল, শাবানা– সবাই আশ্রয়ণশিশু। আশ্রয়ণ প্রকল্প সূত্রে মাথার ওপর টিনের চাল থাকলেও শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই। পটুয়াখালীর গলাচিপার গোলখালী ইউনিয়নের বড়গাবুয়া আশ্রয়ণ প্রকল্পে বসবাসরত এমন প্রায় আড়াইশ শিশু-কিশোর বছরের পর বছর শিক্ষাবঞ্চিত হয়েই বেড়ে উঠছে। আশ্রয়ণ প্রকল্পটির কাছাকাছি কোনো বিদ্যালয় নেই।

স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান গোলাম গাউস তালুকদার নিপু জানান, আশ্রয়ণ প্রকল্পগুলো প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের সেবাগুলো শুধু তারা দিতে পারেন। এর বেশি কিছু করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে সেখানে একটি বিদ্যালয় খুবই প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন।

গলাচিপা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. মাহবুব আলম জানান, সেখানে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ আরো কিছু কাজের প্রস্তাবনা প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ে জমা দেয়া হয়েছে। এগুলো অনুমোদন পেলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

মাগুরায় গড়ে উঠেছে নারকেলের বোতাম শিল্প

● লিটন ঘোষ জয়

নারকেলের খোল বা মালা এখন আর ফেলনা নয়। মাগুরা শহরতলির বরুনাতৈল গ্রামের আবদুল হান্নান এই নারকেলের মালা থেকেই বাণিজ্যিকভিত্তিতে তৈরি করছেন নানা ডিজাইনের রঙ-বেরঙের বোতাম ও মহিলাদের অলঙ্কার। সেই সঙ্গে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আত্মনির্ভরশীল করে তুলছেন এলাকার অনেককে।

ঢাকার গার্মেন্টসসহ বিভিন্ন দোকানে চীন থেকে আমদানি করা কাঠের বোতাম দেখে সর্বপ্রথম তার এই উদ্ভাবনী চিন্তা মাথায় আসে। তখন হাতে যথেষ্ট পুঁজি ছিল না। এক সময় ঝুঁকি নিয়েই এক সময়ের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও কৃষক শেখ হান্নান শেষ সম্বল সামান্য জমিটুকু বিক্রি করে কিনে আনেন ৭টি ড্রিল মেশিন। বাড়ির একটি কক্ষে ৭ জন মহিলা শ্রমিক নিয়ে শুরু হয় তার যাত্রা। প্রথম চালানেই ঢাকার বেশকিছু গার্মেন্টসে সুনাম অর্জন করে তার তৈরি বোতাম। এরপর কঠোর পরিশ্রম তার এই পথচলাকে আরো বিস্তৃত করে। এখন তার বাড়িতে বসেছে ১৪টি মেশিন, যেখানে কাজ করছে ছাত্রী-গৃহবধূসহ ২৫ থেকে ৩০ জন নারীশ্রমিক। প্রতি

মাসে দেড় থেকে দুই লাখ বোতাম তৈরি হচ্ছে তার কারখানায়। শুধু বোতাম নয়, বোতাম তৈরির পর যে অতিরিক্ত অংশ থাকে তা থেকে তৈরি হচ্ছে মহিলাদের সুদৃশ্য কানের দুল। বাকি অংশ সরবরাহ করা হচ্ছে ঢাকার মশার কয়েল কারখানায়।

বোতাম কারখানার মালিক শেখ হান্নান জানান, 'সামান্য দামে সংগৃহীত প্রতি ১ হাজার নারকেলের মালা থেকে ৩০ থেকে ৫০ হাজার বোতাম তৈরি হয়, যার উৎপাদন খরচ ৩ হাজার ৫শ থেকে ৪ হাজার টাকা। এখানে তৈরি বোতামগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে জ্যাকেট, শার্ট, প্যান্টসহ বিভিন্ন পোশাকে ব্যবহৃত হচ্ছে, যার অধিকাংশই যাচ্ছে বিদেশে। পৃষ্ঠপোষকতা পেলে এ শিল্পকে কেন্দ্র করে বড় ধরনের কারখানা গড়ে তোলা সম্ভব। সেই সঙ্গে সম্ভব বিদেশ থেকে বোতাম আমদানির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ তৈরি করা।'

রাজবাড়ী শহররক্ষা বাঁধে ভাঙন

● সৌমিত্র শীল চন্দন

রাজবাড়ী শহররক্ষা বাঁধ থেকে পদ্মার দূরত্ব মাত্র ৫০ মিটার। সম্প্রতি রাজবাড়ী সদর উপজেলার বরাট ও মিজানপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে শুরু হয়েছে তীব্র নদীভাঙন। কর্তৃপক্ষ বলছে, ভাঙন রোধে ব্যবস্থা নিতে উচ্চ পর্যায়ে চিঠি দেয়া হয়েছে।

এক দশক ধরেই নদীভাঙনের তা-ব দেখে আসছে পদ্মাপারের মানুষ। ইতিমধ্যে হাজার হাজার ঘর-বাড়ি, ফসলি জমি, গাছপালা, মসজিদ, মাদ্রাসাসহ বহু স্থাপনা নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙনের হাত থেকে শহররক্ষা বাঁধ ঠেকাতে পদ্মা নদীর গোদার বাজার থেকে বোলতা স্লুইস গেট পর্যন্ত সিসি ব্লক দেয়া হয়। এই সিসি ব্লকের ভেতরেও কোথাও কোথাও ধস নেমেছে। সম্প্রতি জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম খান পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু মন্ত্রণালয় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। রাজবাড়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, 'উজানের পানি আসায় পদ্মায় ভাঙন দেখা দিয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছরে রাজবাড়ী শহররক্ষা বাঁধ নামে একটি প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে। এর ভাটিতে উড়াকান্দা পর্যন্ত ভাঙন দেখা দিয়েছে, যেখানে রয়েছে শহর রক্ষা বাঁধ। ইতিমধ্যে আমরা ৫ কিলোমিটারব্যাপী রাজবাড়ী শহররক্ষা প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প মন্ত্রণালয়ে দাখিল করেছি। এটি পাস হলে আমরা কাজটি করতে পারব।'

রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক মো. রফিকুল ইসলাম খান এ প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করেছি। এ বিষয়ে আমরা পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করায় তারা জরুরিভিত্তিতে কিছু কাজ করেছে। স্থায়ীভাবে বাঁধ রক্ষার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড ১৭৫ কোটি টাকার একটি ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। এটি পাস হলে বাঁধ রক্ষা করা যাবে।'

খুলনায় টিআর-কাবিখার তহবিল হরিলুট!

● শুভ্র শচীন

কাজের নামগন্ধ নেই, প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্বও নেই, অথচ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে টেস্ট রিলিফ (টিআর) এবং কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচির আওতায় চাল-গম, টাকা। যথারীতি তা হরিলুটও হয়ে গেছে। এটা হয়েছে বিদায়ী ২০১৩-১৪ অর্থবছরে। বছরজুড়েই এসব প্রকল্পে লাগামহীনভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি হয়েছে। প্রকল্পের অর্থের অর্ধেক গেছে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাকর্মীদের পকেটে আর চাল ও গম বিক্রি হয়েছে কালোবাজারে। প্রকল্পের কাজ শেষ না করেই প্রকল্পের পুরো তহবিল তোলা হয়েছে। এতে সহযোগিতা করেছেন স্থানীয় পিআইও অফিসের অসাধু কর্মকর্তারা।

খুলনার কয়রা উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের 'দেয়াড়া বেড়ের খাল সেতু থেকে কেয়ামুদ্দিন গাজীর বাড়ি পর্যন্ত' সড়ক সংস্কারের নামে একটি প্রকল্প জমা দেন ইউনিয়নের চেয়ারম্যান। প্রকল্পের অনুকূলে কাবিখা কর্মসূচি থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। নির্ধারিত সময়ে টাকা তুলেও নেন চেয়ারম্যান। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় গিয়ে কাজের কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। এ ব্যাপারে ওই চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান বেল্টু বলেন, 'বর্ষা মওসুমে মাটি ধুয়ে যাওয়ায় মনে হচ্ছে প্রকল্পটির অস্তিত্ব নেই।' একই ধরনের অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে দাকোপ উপজেলার তিলডাঙ্গা ও সুতারখালী ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি প্রকল্পে। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা আতাউর রহমান এ ব্যাপারে বলেন, টিআর-কাবিখা নিয়ে অভিযোগ প্রমাণ হলে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা হবে।